ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সার-সংক্ষেপ

১৫ জুন ২০২০

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা দল
মো. জুলকারনাইন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মোরশেদা আকতার, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
তাসলিমা আকতার, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মনজুর ই খোদা, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
করোনা ভাইরাস মোকাবিলার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বাস্থ্যকর্মী, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় নাগরিক যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ
(১৫ জুন ২০২০)

সার সংক্ষেপ*

১. গবেষণা প্রেক্ষপট ও যৌক্তিকতা

কোভিড-১৯ একটি সংক্রামক রোগ, যা করোনা ভাইরাসের নতুন একটা প্রজাতির মাধ্যমে মানুষকে আক্রান্ত করছে। ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে চীন সরকার উহান প্রদেশে অজানা কারণে নিউমোনিয়ার প্রাদুর্ভাবের তথ্য জানায়। ২০২০ সালের ৭ জানুয়ারি চীন এই অজানা নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী হিসেবে একটি নতুন প্রজাতির করোনা ভাইরাসকে চিহ্নিত করে। ৩০ জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাস সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করে এবং ১১ মার্চ একে মহামারি বা অতিমারি (pandemic) হিসেবে ঘোষণা করে। ১৪ জুন ২০২০ পর্যন্ত সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশে সর্বমোট ৭৭ লাখ ৬৪ হাজার ৯৭৭ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ৪ লাখ ২৯ হাজার ৬৬৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে। বাংলাদেশে ২১ জানুয়ারি হতে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়। সর্বপ্রথম ৮ মার্চ ৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়, এবং ১৮ মার্চ সর্বপ্রথম ১ জন মৃত্যুবরণ করে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে ১৪ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮৭ হাজার ৫২০ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১১৭১ জন। এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ ১৮তম এবং নতুন রোগী শনাক্ত হওয়ার সংখ্যার দিক হতে ১১ম অবস্থানে রয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের আশংকা অনুযায়ী, করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫ কোটি মানুষ অতি দারিদ্র্যের কবলে পড়বে। এছাড়া এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আশংকা করছে, করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশ জিডিপির প্রায় ১.১% হারাবে, এবং প্রায় ১ কোটি লোক বেকার হবে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) মতে, করোনার প্রভাবে আয় কমে যাওয়ায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এবং সার্বিকভাবে দারিদ্র্যের হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ১০ জুন প্রকাশিত ব্র্যাকের একটি জরিপ অনুযায়ী, সাধারণ ছুটি ঘোষণার কারণে ৯৫% মানুষ উপার্জনের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

করোনা ভাইরাস ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করলেও গণমাধ্যমে সরকারের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, দক্ষতা ও সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে ঘাটতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। ইতিপূর্বে টিআইবি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ও জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে। সরকারের গৃহীত কার্যক্রম অধিক কার্যকরতার সাথে বাস্তবায়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে এবং স্বাস্থ্য খাতে টিআইবি'র গবেষণাভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রমে প্রাধান্যের ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাসকে একটি জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে ও সংক্রমণকালে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

১.২ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর - গুণবাচক ও পরিমাণবাচক এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। নিঃসম্ভাবনা (Nonprobability sampling) বা সুবিধাজনক নমুনায়নের (Convenience) মাধ্যমে সারা দেশের সকল বিভাগের মোট ৩৮টি জেলার ৪৭টি জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল (৯ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৩৩টি জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল ও ৫টি অন্যান্য হাসপাতাল) হতে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য এবং ৪৩টি জেলা হতে স্থানীয় নাগরিক (সাংবাদিক, শিক্ষক, পেশাজীবী) হতে ত্রাণ বিতরণের প্রত্যক্ষ তথ্য অনলাইন চেকলিস্টের মাধ্যমে সংগ্রহ সংগ্রহ হরা হয়েছে। এছড়া টেলিফোনে মুখ্য তথ্যদাতার (চিকিৎসক ও সাংবাদিক) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধি, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ের বহুল প্রচারিত ৬টি গণমাধ্যম (প্রিন্ট) হতে নির্দিষ্ট ছকে ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া জরিপে অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ দেশের সকল ধরণের ভৌগলিক ও

* ২০২০ সালের ১৫ জুন ঢাকায় প্রকাশিত 'করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণার সার-সংক্ষেপ।

অন্যান্য বৈচিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই দৈবচয়নভিত্তিক না হলেও বর্তমান জরিপে প্রাপ্ত তথ্য সার্বিকভাবে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরে।
এই গবেষণায় ১৫ এপ্রিল হতে ১৪ জুন ২০২০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে মাঠ পর্যায়ের জরিপের তথ্যসমূহ ২০ মে পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণায় আওতা ও বিশ্লেষণ কাঠামো

করোনা ভাইরাস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত সাতটি বিষয়ে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

১. করোনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন
২. করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ (পরীক্ষাগার সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও পরীক্ষা কার্যক্রম)
৩. করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা (হাসপাতালের সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও সেবা)
৪. সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (হাসপাতাল পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা)
৫. কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ (স্ক্রিনিং, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন)
৬. করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি
৭. ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি

এই গবেষণায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব নির্দেশক হচ্ছে আইনের শাসন, দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি।

২. গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার নানা ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান (মুজিব বর্ষের নির্ধারিত অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস ও নববর্ষ উদযাপন) স্থগিত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় একাধিকবার দুর্নীতির ক্ষেত্রে ছাড় না দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন, এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় এক লাখ তিন হাজার ১১৭ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা ও স্বাস্থ্য বীমার উদ্যোগ গ্রহণ, অতি দরিদ্র ৫০ লাখ পরিবারের জন্য নগদ সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। পূর্বের চেয়ে ২ লক্ষ মে. টন বেশি পরিমাণ বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। চিকিৎসা ব্যবস্থায় জনবল সংকট মোকাবিলায় চিকিৎসক, নার্স ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া করোনা সংকটকালীন দ্রব্যমূল্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ছিল।

তবে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

২.১ আইনের শাসনের ঘাটতি

করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দুইটি আইন যথা 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২' এবং 'সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮'- এদের কোনোটিই যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় নি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং এর অধীনে থাকা দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১৯ অনুসরণ না করার ফলে আইন অনুযায়ী বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ ব্যবহার করা যায় নি। ২৩ মার্চ কোভিড-১৯ কে সংক্রামক রোগ হিসেবে আইনে অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি হলেও বিলম্বের কারণে আইন প্রয়োগ শুরু হওয়ার আগেই বাংলাদেশে কমিনিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংক্রামক রোগ আইন ২০১৮ অনুসারে সারাদেশকে 'সংক্রমিত এলাকা' বা 'দুর্গত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা না করে 'ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে ঘোষণা করে, যা মাঠ পর্যায়ে আইনের প্রয়োগ ও লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

২.২ দ্রুত সাড়াদানে বিলম্ব

সংক্রমণ বিস্তার রোধে বিদেশ হতে আগমন নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি: করোনা ভাইরাসকে অতিমারী হিসেবে ঘোষণা করার পরে বাংলাদেশে প্রায় দুইমাস পর সকল দেশের ফ্লাইট বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ১৫ মার্চ থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন দেশের ফ্লাইট বন্ধ করে এবং পরবর্তীতে ২৮ মার্চ হতে চীন ছাড়া সব আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বিদেশ হতে প্রবেশ পথগুলো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হওয়ার কারণে ২১ জানুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৬ লাখ ২৫ হাজার ৭৪৩ জন যাত্রীর আগমন ঘটে। বাংলাদেশে ২১ জানুয়ারি থেকে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের স্ক্রিনিংয়ের আওতায়

আনা হলেও সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরে হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানার দিয়ে যাত্রীদের স্ক্রিনিং করা হয়, যার মাধ্যমে শুধু শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা যায়। ফলে করোনা ভাইরাস আক্রান্তকে কার্যকরভাবে পৃথক করা সম্ভব হয় নি।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কমিটি গঠনে বিলম্ব: ফেব্রুয়ারির শুরুতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সতর্ক করা হলেও বাংলাদেশ প্রায় দেড় মাস পর (১৬ মার্চ) 'কোভিড-১৯ এর জন্য জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়া দান পরিকল্পনা' প্রণয়ন করে। যার ফলে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এছাড়া সংক্রমণ শুরু হওয়ার দেড়মাস পরে (১৮ এপ্রিল) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়।

অভ্যন্তরীণ চলাচল ও জন-সমাগম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা: সংক্রমণ বিস্তার রোধে ১৭ মার্চ হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি ঘোষণা, এবং ২৬ মার্চ হতে সারাদেশব্যাপি ছুটি ঘোষণা করা হলেও এর সাথে সাথে গণ পরিবহণ বন্ধ না করার কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষ ঢাকা ত্যাগ করে। এছাড়া বাংলাদেশে সকল ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক গণ জমায়েত নিষিদ্ধ করা হলেও খালেদা জিয়ার জামিন উপলক্ষে দলীয় নেতা-কর্মীদের জমায়েত এবং মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আতশবাজি পোড়ানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংকটকালেই নির্বাচন কমিশন একটি সিটি কর্পোরেশনসহ কয়েকটি সংসদীয় আসনের উপ-নির্বাচন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দায়িত্বহীন আচরণ করে। পরবর্তীতে ব্যাপক সমালোচনার কারণে কয়েকটি নির্বাচন স্থগিত করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মের উপসনালয়গুলোতে জমায়েত না করার নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিলম্ব (৬ এপ্রিল) লক্ষ করা যায়।

পরীক্ষাগার প্রস্তুতিতে বিলম্ব: করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সকল সন্দেহভাজনের পরীক্ষার বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গুরুত্ব প্রদান সত্ত্বেও ২৫ মার্চ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে মাত্র একটি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছিল। এই সময়ে পরীক্ষার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও (এই সময়ে নির্ধারিত হটলাইনে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষ পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করে) খুবই কম সংখ্যক পরীক্ষা করা হয় (৭৯৪টি)। ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষাগারের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকার বাইরে পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয় ২৫ মার্চের পর - ততদিনে সীমিত আকারে কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার শুরু হয়ে গেছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতিতে বিলম্ব: করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল প্রস্তুতির দাবি করা হলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর প্রায় ৪৪ শতাংশ সংক্রমণের তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জাতীয় পর্যায়ের সক্ষমতা পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বললেও ২১ শতাংশ হাসপাতালের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ঘাটতি বা চাহিদা যাচাই করা হয় নি। স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে - মাত্র ২২ শতাংশ হাসপাতালে সকল স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। বিবিজিএনএস ও এসএনএসআর নামক নার্সদের দুটি সংগঠনের একটি জরিপ অনুসারে, দেশের ৮৬ শতাংশ নার্সেরই সংক্রমণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক (আইপিসি) প্রশিক্ষণ নেই।

করোনা সংকট মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনার সীমাবদ্ধতা: করোনা সংকট মোকাবিলায় সরকার দ্রুততার সাথে ১৯টি প্যাকেজে মোট ১ লাখ তিন হাজার ১১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা (জিডিপির ৩.৩%) করলেও এক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এসব প্রণোদনা মূলত ব্যবসায়ী-বান্ধব, যেখানে সুদ কমিয়ে ঋণ সহায়তা বাড়িয়ে মুদ্রা সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে এই সহায়তা পৌঁছানোর নিশ্চয়তা নেই। এছাড়া এই সকল প্রণোদনায় চাহিদার সংকোচন উত্তরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেই। মৌলিক চাহিদা পূরণে ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে অর্থ সঞ্চালন বা পর্যাপ্ত নগদ সহায়তার অনুপস্থিতি রয়েছে। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মহীন পাঁচ কোটি দিনমজুর ও শ্রমিক, অস্থায়ী কর্মীর জন্য এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হয় নি। মাত্র ১০ শতাংশ বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছে। কৃষি প্রণোদনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও বর্গা চাষীদের জন্য প্রণোদনার সুযোগ নেই, এবং কৃষি ঋণ মওকুফের ঘোষণা দেওয়া না হলেও কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের জন্য অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ঋণ খেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়েছে।

ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির প্রস্তুতিতে ঘাটতি: গবেষণাভুক্ত ৪৩টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে ২০ শতাংশ জেলায় ত্রাণ বিতরণের জন্য কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া হয় নি এবং ৭৮ শতাংশ জেলার ক্ষেত্রে উপকারভোগীর তালিকা হালনাগাদ করা হয় নি। এছাড়া অধিকাংশ জেলায় (৮২%) চাহিদার অনুপাতে অর্ধেক বা তারও কম পরিমাণে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে এবং বিতরণকৃত ত্রাণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ জেলায় (৯০%) চাহিদার অনুপাতে অর্ধেক বা তারও কম সংখ্যক উপযুক্ত মানুষ ত্রাণ পেয়েছে।

২.৩ সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি

অকার্যকর কমিটি: করোনা মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে নয় ধরনের কমিটি গঠন করা হলেও এসব কমিটির কার্যকরতায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়। জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠক ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হলেও সেই মিটিং-এ শুধু ডেঙ্গু বিষয়ক আলোচনা করে শেষ

করা হয়, পরবর্তীতে এই কমিটির কোনো বৈঠকের তথ্য পাওয়া যায় না। এই কমিটির সভাপতিসহ অন্যান্য সদস্যের অনেক সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবগত না থাকার বিষয়টি লক্ষ করা গেছে (গার্মেন্টস খোলা ও বন্ধ, ঢাকায় প্রবেশ ইত্যাদি)। এছাড়া জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটিগুলোর কার্যকরতার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়। জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির সভা নিয়মিত হলেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (শপিং মল/ গার্মেন্টস খোলা, লকডাউন প্রত্যাহার করা) কমিটির পরামর্শ উপেক্ষিত থাকা এবং অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাদের ওপর নির্ভরতা লক্ষ করা গেছে।

পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি: বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তের পরীক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ হলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে কম পরীক্ষা হচ্ছে (০.২৯%)। সবসময় বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত বিশ্বের সাথে তুলনা করা হলেও পরীক্ষার হাররের দিক থেকে সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯তম। ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও সক্ষমতার ঘাটতির কারণে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নি। জাতীয় কলসেন্টার এবং আইইডিসিআর এর নির্ধারতি হটলাইনে ১৪ জুন পর্যন্ত প্রায় এক কোটি ১০ লক্ষ ফোন কল আসলেও সেই তুলনায় পরীক্ষার সংখ্যা খুবই কম (প্রায় পাঁচ লক্ষ)। বাংলাদেশে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশই ঢাকা-কেন্দ্রিক (৬০টি পরীক্ষাগারের মধ্যে ২৭ ঢাকা শহরের মধ্যে)। সিলেট ও রংপুর বিভাগে দুইটি করে এবং বরিশাল বিভাগে একটি পরীক্ষাগার দিয়ে করোনা আক্রান্তের পরীক্ষা করা হচ্ছে। বর্তমানে মাত্র ২১টি জেলায় পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে মাত্র ৪১.৩ শতাংশ হাসপাতাল নিজ জেলা থেকেই পরীক্ষা করাতে পারে, বাকি ৪৮.৭ শতাংশ হাসপাতালে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার জন্য বিভাগীয় শহরে বা ঢাকায় পাঠাতে হয়।

টেকনোলজিস্ট সংকট, মেশিন নষ্ট থাকা, জনবল ও মেশিন সংক্রমিত হওয়া ও সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে মেশিনের সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে নমুনা পরীক্ষা করছে এমন ১৩টি হাসপাতাল ছাড়া ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ৬০টি ল্যাবে প্রায় ৮৫টির মতো পিসিআর মেশিন দিয়ে প্রায় ২৪ হাজার নমুনা পরীক্ষার সক্ষমতা থাকলেও সর্বশেষ ১৪ দিনে গড়ে ১৩.৬ হাজার নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ১৫ মে থকে প্রতিদিন গড়ে ৪ থেকে ৫টি পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না। ২৫ মে তারিখে সর্বোচ্চ ১১টি এবং ১৫ এবং ২৯ মে তারিখে ৮টি করে পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হয়নি। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর'বি) এর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরীক্ষার জন্য আটটি পিসিআর মেশিন এবং নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী থাকায় অনুমোদন পাওয়ার তারিখ থেকে (৩০ মার্চ, ২০২০) ৩১ মে পর্যন্ত তারা প্রতিদিন ৭০০টি করে দুইমাসে ৪২ হাজার নমুনা পরীক্ষা করতে সক্ষম হলেও তাদেরকে দিয়ে মাত্র ১৫ হাজার ৬৭৮টি পরীক্ষা করানো হয়।

আদালতে একটি মামলা চলমান থাকায় দীর্ঘ ১১ বছর ধরে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জনবল সংকটের কারণে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষায় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে নমুনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ভুল প্রতিবেদন আসছে। এসব ঘাটতির কারণে পরীক্ষাগারগুলোতে সংগৃহীত নমুনা জমা হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নমুনা সংগ্রহ করতে বিলম্ব হচ্ছে। করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ ও প্রতিবেদন দিতে কখনো কখনো ৮ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে, এবং আক্রান্ত ব্যক্তি পরীক্ষা করানোর ক্ষেত্রে যোগাযোগে করতে না পারা, নমুনা সংগ্রহ না করা, নমুনা দিতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা, দীর্ঘ লাইন, রাস্তায় সারারাত অপেক্ষা, একাধিকবার কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হওয়া, গাদাগাদি করে বসিয়ে রাখা ইত্যাদি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এসব সমস্যার কারণে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫৭ শতাংশ হাসপাতাল প্রয়োজনের চেয়ে অর্ধেক সংখ্যক পরীক্ষা করাতে বাধ্য হচ্ছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের দাবি করলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর ৭৪.৫ শতাংশেই দক্ষ জনবলের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (৫১.১%), প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (৫৯.৬%) নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী (৫১.১%) ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষমতার ব্যাপক ঘাটতি উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক হাসপাতালে লক্ষ করা যায়, যা করোনা আক্রান্তের চিকিৎসাসহ অন্যান্য সাধারণ সেবা কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে সরকারি হাসপাতালগুলোর শয্যাসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশে ৩৫০০ আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর থাকার কথা থাকলেও থাকলেও ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে সরকারি হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ ছিল মাত্র ৪৩২টি; ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের ৪৭টি জেলায় কোনো আইসিইউ সুবিধা ছিল না। করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য ২৫ মার্চ পর্যন্ত সারাদেশে মোট আইসিইউ ছিল মাত্র ২৯টি, ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ছিল মাত্র ১৪২টি এবং ১ জুন পর্যন্ত ছিল মাত্র ৩৯৯টি।

২৬ মার্চ পর্যন্ত শুধু রাজধানীর নির্ধারিত ৫টি হাসপাতালে ছিল ২৯টি ভেন্টিলেটর ছিল, যদিও সরকারের দাবি অনুযায়ী এর সংখ্যা ৫০০টি। বর্তমানে সারা দেশে মোট ভেন্টিলেটরের সংখ্যা ১,২৬৭টি - এর মধ্যে মাত্র ১৯০টি করোনার চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে ঢাকায় ৭৯টি এবং অন্যান্য জেলা শহরে ১১১টি। ইমপেরিয়াল কলেজ লন্ডনের একটি গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে, ৩০ জুনের মধ্যে উচ্চ চাপযুক্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ শয্যার প্রয়োজন হবে প্রায় ২০ হাজার, এবং ভেন্টিলেটরসহ আইসিইউ শয্যার প্রয়োজন হবে ৫,২৫৪টি। ভেন্টিলেশন সাপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি হলেও বাংলাদেশে মাত্র ২১টি হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। কোভিড নির্ধারিত হাসপাতালসমূহে ভেন্টিলেটর মেশিন, পেশেন্ট

মনিটর, পালস অক্সিমিটার, এবিজি মেশিন উইথ গ্লুকোজ অ্যান্ড ল্যাকটেট, ডিফেব্রিলেটর, ইসিজি মেশিন, পোর্টেবল ভেন্টিলেটর, এসি, ডিহিউমিডিফায়ার, অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিতে অক্সিজেন সিলিন্ডার ইত্যাদির ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর ৫৩ শতাংশে করোনার প্রভাবে সাধারণ চিকিৎসা সেবায় ব্যাঘাত ঘটছে, যার মধ্যে ৭১ শতাংশ হাসপাতাল জানিয়েছে নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের কারণে অনেক স্বাস্থ্যকর্মী সেবা দেওয়া থেকে বিরত থাকছে বা আক্রান্ত হচ্ছে, ফলে তাদের এই সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। করোনা আক্রান্তের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালের চিকিৎসায় প্রস্তুতি ও সক্ষমতার ঘাটতি কারণে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসাসহ সাধারণ চিকিৎসা সেবায় নানা ধরনের অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে জনগণের চিকিৎসা সেবা গ্রহণে নানা ধরনের দুর্ভোগ লক্ষ করা গেছে।

সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি: ১১ জুন ২০২০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি) সারাদেশে প্রায় ২৩ লাখ পিপিই বিতরণ করেছে বলে দাবি করেছে। এই দাবি অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর (প্রায় ৭৫ হাজার) কমপক্ষে ৩০ সেট সুরক্ষা সামগ্রী পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক স্বাস্থ্যকর্মী এখনো একটিও পায় নি বলে হাসপাতাল থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর প্রায় ২৫ শতাংশের সকল চিকিৎসক এবং ৩৪ শতাংশের সকল নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী পিপিই পান নি বলে জানিয়েছেন। এছাড়া অধিকাংশ হাসপাতালের (৬৪.৪%) স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত মান অনুযায়ী সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ না করার অভিযোগও এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পিপিই সরবরাহ না করে পৃথকভাবে গাউন, গগলস, সার্জিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস, শু-কাভার, হেড কাভার, ফেস শিল্ড সরবরাহ করা হয়। মানসম্মত ও প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতির কারণে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৪ জুন পর্যন্ত ৩৮ জন চিকিৎসক এবং সাত জন নার্স মৃত্যুবরণ করেছে, এবং ১,১৯০ জন চিকিৎসক ও ১১০২ জন নার্স করোনা আক্রান্ত হয়েছে।

এনভায়রনমেন্ট এন্ড স্যোশাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) তাদের একটি গবেষণায় দেখায় যে, করোনা সংকটকালের প্রথম একমাসে ১৪,৫০০ টন সংক্রামক প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয় যার মধ্যে শুধু হাসপাতালগুলো থেকে উৎপন্ন হয় ২৫০ টন। বর্তমানে বাংলাদেশে মাত্র চারটি বিভাগীয় শহরে সীমিত আকারে মেডিক্যাল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা থাকায় এই বিপুল পরিমাণে বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে ফেলা হচ্ছে, এবং এর একটি অংশ একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী পুনরায় ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর মধ্যে প্রায় ৩০% ক্ষেত্রে বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে ফেলা হচ্ছে। এছাড়া পিপিই-এর ব্যবহার, ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত ও বিনষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণে ঘাটতি রয়েছে।

কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধে সক্ষমতার ঘাটতি: বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের স্ক্রিনিং করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রবেশ পথে ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থল, সমুদ্র ও বিমানবন্দরে সাতটি থার্মাল আর্চওয়ে স্ক্যানারের মধ্যে মাত্র একটি সচল ছিল। চীনের উহান-ফেরত ৩১২ জন বাংলাদেশিকে আশকোনা হজ্জ ক্যাম্পে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। পরবর্তীতে ইতালি-ফেরত ১৬৪ জনকে হজ্জ ক্যাম্পে রাখার সিদ্ধান্ত হলেও বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণে তাদেরকে পরদিন নিজ দায়িত্বে হোম কোয়ারেন্টাইনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের পরিবর্তে বিদেশফেরত অধিকাংশ প্রবাসীকে নিজ দায়িত্বে হোম কোয়ারেন্টাইনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত বিদেশফেরত যাত্রীদের মাত্র ৮ শতাংশ হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। সচেতনতার ঘাটতি, প্রশাসনের সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হোম কোয়ারেন্টাইন কার্যকর হয় নি।

সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা: সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতার ঘাটতি, কঠোর আইন প্রয়োগের ঘাটতি এবং সরকারের পক্ষ থেকে ভুল ও বিভ্রান্তিকর বার্তা প্রদানের ফলে সামাজিক দূরত্ব বা লকডাউন ব্যবস্থা কার্যকর হয় নি। একদিকে আইসোলেশন মানতে বলা হয়েছে আবার অন্যদিকে গণপরিবহণ, কল-কারখানা, শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে। গণ পরিবহণ বন্ধ না করে ছুটি ঘোষণার ফলে প্রায় এক কোটির বেশি মানুষ ঢাকা ছেড়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছুটি ঘোষণার পর পোষাক শ্রমিকদের ঢাকা ছেড়ে গ্রামে যাওয়া, গার্মেন্টস খুলে তাদের ঢাকায় ফেরানো, আবার গার্মেন্টস বন্ধ ঘোষণা এবং তাদের ফেরত পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ২৬ এপ্রিল পুনরায় গার্মেন্টস ও উপাসনালয়, ১০ মে হতে দোকান-পাট, শপিং মল সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়া, ঈদের আগে ব্যক্তিগত পরিবহণে আন্তঃ জেলা চলাচল উন্মুক্ত করার মাধ্যমে সার্বিকভাবে লকডাউন পরিস্থিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে। ত্রাণ বিতরণে বেশিরভাগ জেলায় (৯৮%) সামাজিক দূরত্ব মানা হয় নি।

২.৪ অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের ঘাটতি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' গঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও তা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় নি। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে এককভাবে নির্দেশনা প্রদান করছেন। করোনা ভাইরাস মোকাবিলার অন্যতম বিষয় হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা। অথচ এক্ষেত্রে শীর্ষ নীতি-নির্ধারণী জায়গায় কোনো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ নেই। এছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক করোনাকালে বিভিন্ন বিষয়ে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করে তা প্রত্যাহার, করোনা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দুই ধরনের তথ্য

প্রধান, বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা প্রদান বিষয়ে বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে। যেমন, ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে করোনা হাসপাতাল তৈরির বিষয়ে চারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন, এবং সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালেও করোনা চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে তা পরিবর্তন করা হয়।

আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা: করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, যোগাযোগ, বাণিজ্য, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রত্যাশিত হলেও তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রেখেই ছুটি ঘোষণার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষের ঢাকা ত্যাগ, জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যানের (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) অগোচরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সারাদেশে কার্যত লকডাউনের মাঝে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ঢাকায় ফেরা, গার্মেন্টস খোলা রাখা, মসজিদে জামাতে নামাজ বন্ধ, ঈদের সময় রাস্তা খুলে দেওয়া বা বন্ধ রাখা ইত্যাদি ঘটনা আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতার বিষয়টি উন্মোচন করে, যা করোনা সংক্রমণের বিস্তারে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া করোনা প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় কমিটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, যেমন প্রথমে পুলিশের মহাপরিদর্শককে (আইজিপি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরবর্তীতে সমালোচনার কারণে কমিটি সংশোধন করে আইজিপিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বেসরকারি পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করায় ব্যর্থতা: টিআইবি'র সর্বশেষ খানা জরিপে দেখা যায় বাংলদেশে শতকরা ৭৭.৩ ভাগ পরিবার বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ করে। বাংলাদেশে ৬৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও প্রায় ৫ হাজার বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক থাকলেও করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসায় তাদের ভূমিকা কী হবে বা তারা কীভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন ও সমন্বয় করা হয় নি বা কোনো ধরনের নির্দেশনা প্রদান করা হয় নি। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন করোনা চিকিৎসায় তাদের প্রস্তুতির দাবি করলেও এই বিপর্যয়ের সময়ে অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তারা অন্যান্য চিকিৎসা সেবাও বন্ধ করে দিয়েছে যা বিপুলসংখ্যক মানুষের দুর্ভোগ ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সকল বেসরকারি হাসপাতালকে একাধিকবার করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশ দিলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ তদারকির ঘাটতি ছিল। করোনাভাইরাস মোকাবিলার সকল কার্যক্রম সরকারের একক নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলেও (বসুন্ধরার হাসপাতাল স্থাপন, রেমডিসিভির ব্যবহারের অনুমোদন) কোনো কোনো ক্ষেত্রে (গণস্বাস্থ্যর টেস্ট কিট অনুমোদন) বিলম্বিত সিদ্ধান্ত প্রদানের কারণে এবং সরকারের যথাযথ সহায়তার অভাবে বা বিরোধিতার কারণে বেসরকারি পর্যায়ের বেশ কিছু স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি।

ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়ের ঘাটতি: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬০ শতাংশ এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণের কারণে অনেক ক্ষেত্রে ত্রাণ পাওয়ার প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তিরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

২.৫ স্বচ্ছতার ঘাটতি

তথ্য প্রকাশে বিধি-নিষেধ আরোপ: নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার ও সরকারের গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতায় গণমাধ্যমের অবাধ ও মুক্ত ভূমিকা পালনে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতে তথ্য গোপন নয়, তথ্য প্রচারে প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় আরও বেশি অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত অতীব জরুরি। কিন্তু দেশে করোনার প্রকোপ শুরুর পর থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া জনসমক্ষে, সংবাদপত্রে বা অন্য কোনো গণমাধ্যমে কোনো বিবৃতি বা মতামত প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, যা সেবা কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যের প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব: দেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ বিতরণে চুরি ও আত্মসাতের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে গণমাধ্যমকর্মীদের বাধা, হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর আওতায় মোট ৬৭টি মামলা দায়ের করা হয়, এবং এই সময়কালে ৩৭ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত গুজব ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কার্টুনিস্ট, সাংবাদিকসহ ৭৯টি ঘটনায় মোট ৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রচারণা বা গুজব মনিটরিং করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের ৩০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের জন্য নজরদারি সেল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হলেও নজরদারি অব্যাহত রয়েছে বলে জানা যায়।

করোন ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি: করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এমন অনেকেই সরকারি হিসাবের বাইরে থেকে যাচ্ছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষা না হলে, বা হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা মৃত ব্যক্তিদের তথ্য কর্তৃপক্ষকে না জানালে তা সরকারি হিসাবে যোগ হচ্ছে না। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন কবরস্থানে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তিদের সৎকারের সংখ্যার মধ্যে অমিল রয়েছে। ফলে করোনা ভাইরাসে মৃতের সরকারি হিসাব নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে।

২.৬ অনিয়ম ও দুর্নীতি

করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম-দুর্নীতি: করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অনিয়ম-দুর্নীতি লক্ষ করা গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলো থেকে নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের বিষয়ে (৫৯ শতাংশ হাসপাতালের ক্ষেত্রে) সবচেয়ে বেশি অভিযোগ উঠে এসেছে।

চিকিৎসায় অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার অভিযোগ: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২৩ শতাংশ হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া যায়। যার মধ্যে করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা না পাওয়া, স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগীদের কাছে না গিয়ে ইন্টারকমে ফোন করে খোঁজখবর নেওয়া, দরজার বাইরে খাবারের প্যাকেট রেখে যাওয়া, রোগীর কক্ষ পরিষ্কার না করা, যথাসময়ে অক্সিজেন সরবরাহ না করা, রোগীর এটেনডেন্টদের দিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ বহন করানো, হাসপাতালে ভর্তি রোগী মারা গেলে নমুনা পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা, নারী ও পুরষদের একই আইসোলেশন কক্ষে রাখা এবং রোগী মারা গেলেও মৃতদেহ দীর্ঘ সময় না সরানো ইত্যাদি অবহেলা ও অব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য।

পরীক্ষাগারে দুর্নীতি: সরকারের কাছ থেকে বাণিজ্যিকভাবে পরীক্ষার অনুমোদন পাওয়া অধিকাংশ বেসরকারি পরীক্ষাগার করোনা পরীক্ষায় সরকার-নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত ১,০০০ থেকে ১,৫০০ টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রয়োজনের চেয়ে পরীক্ষাগারের সংখ্যা কম থাকায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষার বিষয়টিকে পুঁজি করে বিভিন্ন পরীক্ষাগারের সামনে থাকা দালাল সিরিয়াল বিক্রি করছে। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ১,০০০ থেকে ১,৫০০ টাকায় এই সিরিয়াল কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে 'করোনা ভাইরাস আক্রান্ত নয়' এমন সার্টিফিকেট বিক্রি করা হচ্ছে।

চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি: করোনার কারণে সৃষ্ট দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে পাঁচ থেকে ১০ গুণ বাড়তি মূল্যে মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় করে একটি চক্র লাভবান হচ্ছে এবং এসব মানহীন সামগ্রী হাসপাতালে সরবরাহ করে স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। একটি সিন্ডিকেট বিভিন্ন ফার্মের নামে সব ধরনের ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়, এবং এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একাংশের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে এন-৯৫ মাস্ক লেখা মোড়কে সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক সরবরাহ এর একটি উদাহরণ।

চলমান করোনা পরিস্থিতিতে পিপিই, মাস্কসহ বিভিন্ন সামগ্রী একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে। এই ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং কেন্দ্রীয় ঔষধ প্রশাসনের দুই-একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়া অন্যরা কিছুই জানছে না। এতে করে কোনো সামগ্রীর মূল্য কত তা জানা যাচ্ছে না। বেশিরভাগ সামগ্রী মৌখিক আদেশে সরবরাহ করা হয়েছে। আবার লিখিতভাবে যেসব কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোরও মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নি। বর্তমানে তীব্র সংকট মোকাবিলায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থে ভেন্টিলেটর আমদানির পরিকল্পনা নেওয়া হলেও ক্রয় প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির অভিযোগে করোনাকালের ১২ সপ্তাহেও ক্রয়াদেশ দেওয়া সম্ভব হয় নি। এছাড়া 'করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জরুরি সহায়তা' শীর্ষক প্রকল্পে অস্বাভাবিক ক্রয় মূল্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বাড়িয়ে প্রতিটি সামগ্রীর মূল্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

একটি হাসপাতালে ব্যবহৃত পিসিআর মেশিন থাকা সত্ত্বেও নতুন পিসিআর মেশিনের ক্রয়ের চাহিদা প্রেরণ করা হয়। এছাড়া স্বাস্থখাত দুর্নীতিগ্রস্ত থাকার কারণে অনেক অবকাঠামো ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়নি। একটি মেডিক্যাল কলেজে ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা চলমান থাকায় পাঁচ বছর অব্যবহৃত অবস্থায় ১৬টি ভেন্টিলেটর পড়ে ছিল। পরবর্তীতে ১০টি সচল করা হয়। পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ করতে সরকারিভাবে ৩১টি আরটি পিসিআর মেশিন ক্রয় করা হয়। করোনা সংকটকালে বিশ্বব্যাপি চাহিদার কারণে সরবরাহকারী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ২০০৯ সালের পুরানো মডেলের পিসিআর মেশিন সরবরাহ করে। মেশিনের ত্রুটির কারণে কয়েকটি হাসপাতাল এই মেশিন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কয়েকটি পরীক্ষাগারে বারবার পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার এটা একটি কারণ।

স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা সামগ্রী বণ্টনে অনিয়ম: গবেষণায় জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলো থেকে নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম চিত্র উঠে আসে। অনেক প্রতিষ্ঠানে মজুদ থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ সামগ্রী বণ্টন করা হয় নি (৭.৭%) এবং নিরাপত্তা সামগ্রী বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য (৫.১%) অর্থাৎ পছন্দের সহকর্মীদের মধ্যে বা শুধুমাত্র কর্মকর্তা পর্যায়ে সুরক্ষা সামগ্রী বণ্টনের বিষয়টি উঠে এসেছে।

ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতি: গবেষণা এলাকার শতকরা ৮২ ভাগ এলাকায় সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, এবং প্রায় ৪২ ভাগ এলাকার ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে কোনো তালিকা অনুসরণ না করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া গবেষণা অন্তর্ভুক্ত এলাকার শতভাগ ক্ষেত্রেই অতি দরিদ্রদের নগদ সহায়তা (২,৫০০ টাকা) প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে। নগদ সহায়তার তালিকায় বিত্তশালী ও জনপ্রতিনিধিদের সচ্ছল আত্মীয়স্বজনের নাম থাকা এবং একই মোবাইল নম্বর ২০০ জন উপকারভোগীর নামের বিপরীতে ব্যবহৃত হওয়ার অভিযোগ উঠে এসেছে। প্রায় সকল গবেষণা এলাকার ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে সামাজিক দূরত্ব না মানার অভিযোগ রয়েছে।

১০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণে ২১৮টি দুর্নীতির ঘটনায় মোট ৪,৫৯,৮৭০ কেজি ত্রাণের চাল উদ্ধার করা হয়েছে। এসব দুর্নীতির ঘটনায় ৮৯ জন প্রতিনিধিকে (ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, জেলা পরিষদ সদস্য, পৌর কাউন্সিলর ইত্যাদি) সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। গবেষণাভুক্ত এলাকা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এসব দুর্নীতির ক্ষেত্রে মাত্র ৪ শতাংশ এলাকায় জড়িত সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৭ জবাবদিহিতার ঘাটতি

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতির উদ্দেশ্যে কিছু কার্যক্রম সম্প্রসারণ না করে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং এই দুর্যোগকালীন সময়ে অনিয়ম-দুর্নীতি করলেও দায়ী ব্যক্তিদের যথাযথ জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যথাযথভাবে আন্তঃ জেলা চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রারম্ভিক পর্যায়ে পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ না করা, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ না করা, এন-৯৫ মাস্ক ক্রয়ে দুর্নীতি, নিম্নমানের পিসিআর মেশিন ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে দায়ী ও জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা, তাদের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় নি। উপরন্তু সরবরাহকৃত মাস্ক ও সুরক্ষা পোশাকের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার কারণে বিভিন্ন জায়গায় চারজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা (বদলি, কারণ দর্শানো নোটিশ, ওএসডি) গ্রহণ করা হয়েছে। জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সীমিত আকারে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা অনেকক্ষেত্রেই লোকদেখানো (যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করে দ্রুততার সাথে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালের ৬ জন চিকিৎসককে সাময়িক বরখাস্ত করা, সাময়িক বহিষ্কার), এবং এসব ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত সরকারি প্রেস ব্রিফিং-এ সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে অনিয়ম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করা ও দুর্নীতিগ্রস্তের বদলে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীকে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসার প্রবণতা মাধ্যমে প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। দীর্ঘসময় ধরে পরিকল্পনাহীনতা, সুশাসনের ঘাটতি ও অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কারণে স্বাস্থ্যখাতের দুর্বল সক্ষমতা করোনার সঙ্কটে উন্মোচিত হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি প্রকটভাবে লক্ষ করা গেছে। চীন দেশে করোনার প্রাদুর্ভাবের পর তিনমাস সময় হাতে পেয়েও করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ না করায় এবং সুশাসনের ঘাটতির কারণে দেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। একদিকে প্রস্তুতিহীনতা, সমন্বয়হীনতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা অন্যদিকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ না করে বিপুল সংখ্যক মানুষকে পরীক্ষার আওতার বাইরে রাখা, এবং কঠোরভাবে চলাচল নিয়ন্ত্রণ না করার কারণে সংক্রমণ সারা বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। লকডাউনসহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে আমলা-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে।

স্বাস্থ্যখাতের ক্রয়ে দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণের জন্য করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ব্যাপক সামাজিক সম্পৃক্ততা বা অংশগ্রহণের অভাব, এবং মাঠ পর্যায়ে করোনা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারণায় ঘাটতির কারণে জনসাধারণে মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয় এবং কোয়ারেন্টাইন ও লকডাউন ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। দায়িত্বহীনতা এবং দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সামগ্রীর সংকট ও পরবর্তীতে মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখিন হয় এবং যা চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সংকট সৃষ্টি করে।

লকডাউনের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণ এবং মাঠ পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রণোদনা প্রকল্পসমূহ একদিকে ব্যবসায়ীবান্ধব ও ঋণভিত্তিক এবং অন্যদিকে অতি দরিদ্রদের জন্য এই আর্থিক সহায়তা অপ্রতুল। ঋণ খেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ তৈরির কারণে এই প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

করোনা মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে অনিয়ম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করা হচ্ছে এবং দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় না নিয়ে এসে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীকে হয়রানি ও নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান করছে।

৪. সুপারিশ

সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারক কর্তৃক করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

১. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিদ্যমান যন্ত্রপাতি ও জনবলের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার সুবিধা জেলা পর্যায়ে আরও সম্প্রসারণ করতে হবে, এবং বিদ্যমান সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. বর্তমানে করোনা ভাইরাসের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ হার ও মৃত্যুর সময়ে লকডাউন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হবে। লকডাউন প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং পরীক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে সংক্রমণের ব্যাপকতার নিরিখে এলাকাভিত্তিক ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে।

৩. করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. স্বাস্থ্য খাতে জেলা পর্যায়ে সার্বিকভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে (জিডিপির ৫%), এবং স্বাস্থ্যখাতের ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।

৫. স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়ে অনিয়ম দুর্নীতি রোধে জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. সকল পর্যায়ের হাসপাতালে স্ক্রিনিং ও ট্রায়াজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। সম্মুখ সারির সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সমন্বিত চিকিৎসার প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালসমূহকে সরকারি বিধির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সকল বেসরকারি হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সকল হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার পাশাপাশি অন্যান্য রোগের জন্য নিয়মিত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসায় অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. ব্যবহৃত সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. অতি দরিদ্র এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, দিনমজুরদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। চলতি কৃষি ঋণ মওকুফ করতে হবে।

১১. ত্রাণ ও সামাজিক সুরক্ষার উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদ করতে হবে। ত্রাণ বা নগদ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১২. দেশজুড়ে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. স্বাস্থ্যবিধির সফল বাস্তবায়নে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৪. তথ্য প্রকাশ এবং তথ্যে প্রবেশগম্যতার সুবিধার্থে ও ম্যানেজমেন্টের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের স্বার্থে গণমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. ত্রাণ বিষয়ক দুর্নীতির সাথে জড়িত জনপ্রতিনিধি যাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের আইনগতভাবে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

****